কর্মক্ষেত্র

টেকনো ইন্ডিয়া, আজকাল, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির সব স্তরের কর্মীদের নিয়ে ছিল তাঁর বৃহত্তর পরিবার

মধ্যরাতের সুনামি

দেবাশিস দত্ত

— কেন নয়? কেন হবে না?

— সম্ভব নয় বলে।

— সম্ভবই নয়? তাহলে কি অসম্ভব?

— হ্যাঁ, অসম্ভব।

— বেশ তাহলে বোঝাও। কেন অসম্ভব? আমি তো জানি না। কিন্তু শিখতে চাই।

(বুঝিয়ে বলার পর, টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে, 'বুঝলাম। এত সব জানতামই না।')

সাত বছর সাত মাস পর 'খেলা' প্রকাশিত হওয়ার আগে এভাবেই কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। সেই প্রথম নয়, কাজের সূত্রে প্রথম এবং চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত 'খেলা' পত্রিকাকে ঘিরে যতবার আলোচনা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে, প্রত্যেকবার একটাই আর্জি ছিল, 'আমাদের ম্যাগাজিনগুলো যেন এক নম্বরে পৌঁছে যায়।'

পৌঁছোনোর তাগিদ ছিল, অসুস্থ শরীর নিয়েও ওই উদ্যোগে ভাটা পড়তে দেননি যে মানুষটা, সেই আজকালের ডিরেক্টর মৌ রায়চৌধুরী চলে গেলেন বিনা নোটিসে। যেহেতু শেষযাত্রায় অনুপস্থিত ছিলাম, তাই, এখনও মনে হয় এই বুঝি হোয়াটসঅ্যাপে ডেকে পাঠাচ্ছেন আজকাল ভবনে, এসআরসি-র চেম্বারে।

৬ মে গভীর রাত থেকে ৭ মে ভোর পর্যন্ত যমে-মানুষে টানাটানির পর, আজকালের রানি গেলেন হেরে। দুঃসংবাদটি প্রথম জানান পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। পাঠিয়েছিলেন একটি মেসেজ, 'মৌ ইজ সিরিয়াসলি ইল। খুব ক্রিটিক্যাল।' আমি তখন কাতারগামী বিমানে ওঠার অপেক্ষায়। মাঝে কয়েকবার নানা কারণে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু ফিরবে না, এটা ৬ মে রাতে ভাবা সম্ভবই ছিল না। কাতার পৌঁছোনোর পর এল আরেকটি এসএমএস, 'মৌ আর নেই।'

পরবর্তী উড়ান লন্ডনের পথে। লর্ডসে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে হাজির থাকার ব্যাপারে যেতে হচ্ছিল। ওই দুঃসংবাদ পাওয়ার পর মনে হল যেন আমরা সবাই এক সুনামির মাঝে আটকে পড়েছি। প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো খবর। এক ঝটকায় আমরা হঠাৎই যেন অনাথ হয়ে গেলাম।

চলো, কিছু একটা করি। সারাক্ষণ এরকম একটা তুরীয় মেজাজে এগোতে চাইতেন। ডানা মেলার শখটা এভাবে যে হঠাৎ করেই মুখ থুবড়ে পড়বে, এটা আমাদের সবার কাছেই কল্পনাতীত। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুনীল গাভাসকার, মান্না দে থেকে লিওনেল মেসি— সব ব্যাপারে ছিল ওঁর আগ্রহ। জানার নেশা। এবং সেই লক্ষ্যে ছুটে যেতেন অবাধ গতিতে। একান্ত নিজস্ব গতি। আজকালের পতাকা আরও উঁচুতে তুলে ধরার জন্য সারাক্ষণ চেষ্টা করতেন। আলোচনা করতেন। এবং চাইতেন সবাই মিলে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আজকাল-কে আরও অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ থাকে। এখন ওঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের সবাইকেই এই উদ্যোগ নিতে বাড়তি দায়িত্ব বহন করতে হবে। সুনামির ক্ষত তো চটজলদি যাবে না। তবু, মৌ-এর মুখটাকে সামনে রেখে, আমাদের সবাইকে, নিরন্তর চেষ্টায় ডুবিয়ে রাখতে হবে।

কাতারে বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামে

ব্যক্তিগত কথা

প্রচেত গুপ্ত

ব্যক্তিগত স্তরে এত কথা, এত ঘটনা রয়েছে যে, পাতার পর পাতা লিখেও শেষ করতে পারব না। আর সে-সব ঘটনায় শ্রীমতী মৌ রায়চৌধুরী খানিকটা অচেনা, খানিকটা অন্যরকম এবং অনেকটা 'আপনজন'। এমন কয়েকটা ব্যক্তিগত গল্প কি আমি সুন্দর করে এখন বলতে পারি?

আচ্ছা, দেখা যাবে। তার আগে অন্য আলোচনা।

শ্রীমতী মৌ রায়চৌধুরীর সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সাহিত্যের জন্য ব্যাকুল হওয়া আমাকে বারবার অবাক করেছে। কেন করেছে? শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তো কতজনেরই টান থাকে। অবাক হওয়ার কী আছে? আছে বইকি। আমি আমার ক্ষুদ্র বোধ-বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছিলাম, শ্রীমতী রায়চৌধুরীর এই আবেগটি খাঁটি। অন্তরের। তাঁর ভাল থাকার সম্পদ।

কর্মসূত্রের আগে থেকে পরিচয়, তবে যোগাযোগ বাড়ল অফিসের কাজের মধ্যে এসে। আজকাল-এর বই প্রকাশনা এবং আজকাল শারদ সংখ্যা নিয়ে আমার সঙ্গে কিছু কিছু কথা বলা শুরু করলেন। আমি মোটে খুশি হইনি। বিরক্তই হলাম। নিশ্চয় 'বোঝা' আসবে। আমার লেখালিখির ক্ষতি হবে। যে করেই হোক, এই 'বোঝা' এড়াতে হবে। চেষ্টা শুরু করলাম, কিন্তু ঘটনা ঘটল উল্টো। 'বোঝা' নামাতে তো পারলামই না, আমি পড়লাম বিপদে। শ্রীমতী রায়চৌধুরী আমাকে সেই বিপদে ফেললেন। দেখলাম, এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে, কাজ করতে আমার ভাল লাগছে। অনুভব করলাম, মানুষটার ভেতরে অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু সবথেকে বেশি জায়গা দখল করে রেখেছে গান আর লেখালিখি। কেউ রেগে গেলেও

আমাকে বলতে হচ্ছে, লেখালিখি জগতের সবথেকে বড় দোষ নিজেকে ‘আহামরি’ ভাবা। ‘আমারটাই সেরা’। আমি নিজেও এই দোষ থেকে মুক্ত নই। শ্রীমতী রায়চৌধুরী এই মিথ্যে ‘অহং’ থেকে মুক্ত ছিলেন। বিস্ময়কর রকমের মুক্ত। সাহিত্য নিয়ে কোনও মিছে হাততালি, কোনও বন্দনা তাঁকে স্পর্শ করত না। বই প্রকাশ, শারদীয়া সংখ্যায় লেখা প্রকাশ নিয়ে কতবার বলেছি, ‘না। আমার মতে, এটা ঠিক হচ্ছে না’, উনি মন দিয়ে শুনেছেন। কিছু মেনেছেন, কিছু মানেননি। ভেবেছি, আর কথা বলবেন না। ‘না’ বলা লোককে কে পছন্দ করে? আশ্চর্য করে উনি আবার ‘না’ শোনার জন্য আমাকে ডেকেছেন। একে বিপদ বলব না? এক সময় দেখি, এই বিপদে পড়ার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

ধীরে ধীরে তাঁর লেখালিখির সঙ্গে পরিচয় হল। তিনিই করালেন। ছাপা পর্যন্ত যেতে চাইতেন না। নিজের লেখা পড়তে দিয়ে বলতেন, ‘কিছুই হয়নি।’ খুঁতখুঁতানির চরম। বারবার সংশোধন, সম্পাদনা করতেন। করেই যেতেন। যাঁদের বিশ্বাস করতেন তাঁরা পরামর্শ দিলে শুনতেন মন দিয়ে। ছাত্রীর মতো হয়ে যেতেন। এখন ক’জন লেখক এমন করে? করতে জানে?

শ্রীমতী মৌ রায়চৌধুরী কি একজন মস্ত বড় লেখক? না, উনি মস্ত বড় লেখক নন। কেউ কেউ একথা বলে ‘খুশি’ করতে চাইত। পরে এই অধমের কাছে নাম করে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ লেখালিখির বিষয়ে তিনি ছিলেন সিরিয়াস। একজন প্রকৃত লেখকের যা হওয়া উচিত। বেঁচে থাকার অফুরান আনন্দ আর গভীরের বেদনাকে নিজের মধ্যে লালন করতেন। সুখ–স্মৃতিকে প্রকাশ করার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথে থাকতেন মগ্ন হয়ে। সরল ভাষায় নিজের আবেগ প্রকাশ করতে চাইতেন। এই গুণ একজন ‘প্রকৃত লেখক’–এর মধ্যেই থাকে। সেখান থেকেই সে ‘বড়’ হয়।

এবার ব্যক্তিগত দুটো মজার ঘটনা বলি? একেবারে গল্পের মতো।

থাক, বলব না। এ–সব শুধু ‘আমাদের ছিল’, তেমন ‘আমাদেরই থাকুক’।

‘মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি...’

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তিনি আচমকা চলে যাওয়ার চারদিন পরে অফিসের কাজে দেখা হল প্রসেনজিতের সঙ্গে। এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘মৌ চলে গেল? মানতে পারছি না। আমার বোন ছিল মৌ। বোন চলে গেলে...’

কয়েক বছর হল আজকাল প্রকাশনার বইয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মৌ রায়চৌধুরী। অপরিসীম ভালবাসা ছিল আজকালের বই নিয়ে। পুরনো বই নতুন

সংস্করণে আনা এবং নতুন বিষয় নিয়ে বই প্রকাশে তাঁর আগ্রহ অন্যদেরও আরও বেশি উদ্দীপ্ত করত। আড়াই দশকের বেশি আগে আজকাল সম্পাদক অশোকদার দেওয়া প্রাইজ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আত্মকথা লিখেছিলাম সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মৌ রায়চৌধুরী একদিন বললেন, দুটো বই-ই আরও ভাল করে, ভাল কাগজে, ভাল ছবি দিয়ে, আরও ভাল প্রচ্ছদ করে ছাপা দরকার। আবার নতুন উদ্যোগে নতুন করে প্রকাশিত সেগুলি। বই দেখে খুব খুশি।

পরপর দু’বারের বই, ‘একটি আশ্চর্য প্রেমের গল্প’ এবং ‘জ্যান্ত দুর্গা’র বিষয় দেখে খুব খুশি। কিন্তু কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, ‘এমন ছোট বই করলে কিন্তু হবে না। বড় বই চাই। মনে থাকে যেন।’ বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চে ‘জ্যান্ত দুর্গা’ প্রকাশের সময় বলেছিলাম, আমাদের বই প্রকাশনায়, বইঘরেও একজন মা আছেন। তিনি মৌ রায়চৌধুরী। উত্তমকুমারকে নিয়ে গত ২৪ জুলাই একটা বিশেষ ক্রোড়পত্র করেছিলাম। সেটা দেখে খুশি হয়ে বললেন, ‘উত্তমকুমারকে নিয়ে একটা বই করতে হবে। তুমি শুরু করো। আমি সঙ্গে আছি।’ কাজ শুরু হল। নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন। সামনাসামনি কথা হয়েছে। ফোন করে বলেছেন, ‘প্রসেনজিৎ, ঋতুপর্ণার সঙ্গে কথা হয়েছে? শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে?’ মাসখানেক আগে বললাম, ৮০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে। বললেন, ‘সবচেয়ে ভাল হতে হবে বইটা। আমি সঙ্গে আছি।’

হ্যাঁ, সঙ্গে ছিলেন। সঙ্গে থাকবেনও। আমি জানি।

মৌ রায়চৌধুরী চলে যাওয়ার পরে শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বহু মানুষ অসহায়ের মতো ফোন করেছেন। কেউ বলছেন, ও তো আমার বোন ছিল। কেউ বলছেন, এমন বড় হৃদয় কোথাও পাওয়া যাবে না। এই সব অনুভূতির কথা, এই সব প্রতিক্রিয়া শুনতে শুনতে অমোঘ একটা পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে যাচ্ছিল- ‘মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি’।

এটাই তো বাঁচা। মৃত্যুর পরেও হেঁটে চলেছেন শ্রীমতী মৌ রায়চৌধুরী। বহু মানুষের হৃদয়ে যে জায়গা তিনি করেছেন, তা চিরকাল অমলিন থাকবে।

এবং, তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। চিরদিন।

টিউলিপ ফুটছে

ডাঃ পল্লব বসুমল্লিক

অন্তত পাঁচটা মিসড কল! কার? যাঁর কোনও কথা জীবনে অমান্য করতে পারিনি। অশোক দাশগুপ্ত। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে সেদিন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। মুম্বই স্টুডিওয় তখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ফোনের ওপার থেকে প্রবল উদ্বেগ, 'কী করছ তুমি, ঠিক বুঝতে পারছি না। মেয়েটাকে দেখো ভাল করে। মৌ এত কষ্ট পাচ্ছে। বেচারা হাঁটতেই পারছে না। আরও কত সমস্যা।' বিস্তারিত ব্যাখ্যার সময় তখন ছিল না। অশোকদাকে বলিনি, আলাপের প্রথম দিন থেকেই তাঁর যাবতীয় চিকিৎসা-বৃত্তান্ত আমার সঙ্গে নিজেই তিনি শেয়ার করতেন। কাকে দেখাচ্ছেন। কে কী পরামর্শ দিল। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট। স্টেপ নেক্সট। রাষ্ট্রনায়কদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হয়। চিকিৎসক যাঁরা, তাঁদেরও অলিখিত শপথ থাকে- কোনও রোগীর অসুখ বা কী চিকিৎসা চলছে তা পাবলিক ডোমেনে আনতে নেই। মৃত্যুর পর আসা রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টগুলো এখনও পর্যন্ত মোবাইলে পরিহাসের মতো শোভা পাচ্ছে।

শব্দের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু, মৌ রায়চৌধুরীকে কয়েকশো শব্দে আদৌ ধরা যায়? তিরিশ হাজারও নিতান্ত কম মনে হয়। সত্যম বা ঋষির কথা ছেড়েই দিলাম। তাঁদের পাঁজর ভাঙার হাহাকার। কিন্তু মৌ তো শুধু একটা পরিবারের নন। এই যে আজ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে, সমাজের বিস্তীর্ণ অংশে মানুষ পাচ্ছি যাঁদের চোখ ভেজা অথবা গলায় দলা-পাকানো থমকে যাওয়া কান্না— কেন? শুধু মানুষটার জন্য। আপনার কন্যা, বোন, বস বা পরম বান্ধব হতে পারেন— আসলে তিনি আদ্যন্ত একজন মা। তাঁর স্নেহ, তাঁর মায়া, তাঁর যত্ন সহস্র জীবন ছুঁয়েছে।

পারফেকশনিস্ট হিসেবে আমার চোখে এক নম্বর সত্যজিৎ রায়। আকাশবাণীর হয়ে এক সাক্ষাৎকারে মানিকবাবুকে সে প্রশ্নটা করার দুঃসাহসও দেখিয়েছিলাম। মৌ-ও ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিলেন। 'সুস্থ' বা 'সফর' পত্রিকার প্রচ্ছদ বাছাই ঘিরে কতবার তুমুল মতপার্থক্য হয়েছে। তিনি ছিলেন সুন্দরের পূজারি। জীবন সঁপেছিলেন রবীন্দ্রনাথে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয়ও নিলেন সেই পরম নাথে। কত কাজ অপূর্ণ রয়ে গেল। নিয়মিত আলোচনায় সব জানাতেন। সত্যমের স্বাস্থ্য আর কঠোর পরিশ্রম নিয়ে ভাবনা, ঋষির আরও উত্থান-স্বপ্ন। প্রচণ্ড জীবনরসিক। দুটো হাঁটুর অপারেশন হবে, ঠিক ছিল। তারপর উড়ে যাবেন নেদারল্যান্ডস। জুলাইয়েই তো কাউকেনহফ গার্ডেন ঢেকে যায় স্বর্গীয় টিউলিপে। ৭৯ একর জুড়ে শুধু ফুলের অনন্ত বিস্তার, সে সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। আমি নিশ্চিত, দেখবেনই মৌ।

মনখারাপের কোলাজ

তপশ্রী গুপ্ত

ম্যাডাম, আপনার থেকেই ধার করতে হল শিরোনামটা। নতুন কবিতার বই বেরোবে, মনখারাপে আটকে আছেন আপনি। সামনে বসে আমি আর শুভজিৎ। এর পরের শব্দটা কী হবে? হঠাৎ মাথায় এল, কোলাজ। আপনি উচ্ছ্বসিত। বইয়ের নাম তবে 'মনখারাপের কোলাজ'। ঠিক যেমন আপনি উচ্ছ্বসিত ঢাকার শপিং মলের ফুড কোর্টে বিচিত্র স্বাদের দোসা খেয়ে কিংবা নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে রিকশায় বসে সাহেব রিকশাওয়ালার 'তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম' গান শুনে। কতবার শাড়ির দোকানে আপনাকে চোখের ইশারায় বারণ করেছি, ম্যাডাম এত উচ্ছ্বাস দেখাবেন না, ওরা একটুও দাম কমাবে না। আপনি অপ্রতিরোধ্য। ততক্ষণে ওদের ফোন নম্বর পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছেন। দোসাটা মোটেই ভাল খেতে নয় কিংবা শাড়িগুলো ঠকাল বলামাত্র আপনি আপনার ভুবন-ভোলানো ট্রেডমার্ক হাসিটা হেসে বলবেন, ওরা কত ভাল দেখেছ। ম্যাডাম, আপনার এই কিশোরীসুলভ সারল্যকে কে চ্যালেঞ্জ করবে বলুন! আর দিল্লি এয়ারপোর্টের বিজনেস লাউঞ্জে সেলিব্রিটি শেফ সঞ্জীব কাপুরকে দেখে আপনার উন্মাদনা, ঠিক যেন আঠেরো বছরের মেয়ে।

শিলিগুড়িতে 'মেধারত্ন' উৎসবে চা-বাগান শ্রমিকদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইজ দিতে উঠে চোখের জল মুছলেন, ওদের পায়ে যে জুতো নেই।

কাজের জগতের কথা তো কিছু বলাই হল না। আজকাল ডট ইন পোর্টালের মাথার ওপর অভিভাবকের মতো ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা দিয়েছেন ষোলোআনা। ভাল-মন্দ সবটুকু বলতেন, দিশা পেতাম। ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে যে এতরকমের এত কাজ সামলানো যায়, আপনাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। রাত দেড়টা, দুটো, একবারও ভাবিনি, এখন কি টেক্সট করা যাবে?

আপনার প্রিয় একটা ঘটনা, যেটা আপনি সবাইকে গল্প করতেন, সেটা দিয়ে শেষ করি। একবার ঢাকার হোটেলে কেউ দারুণ খেজুর গুড় দিয়ে গিয়েছিল। আপনি আর আমি একটি প্লেটে কিছুটা নিয়ে খেলাম এবং মুগ্ধ হয়ে বললাম, একদম খাঁটি, মুখে খেজুরের বীজ পর্যন্ত পড়ল। শুনে ঋষি বলল, করেছ কী তোমরা? আমরা ক'জন খেজুর খেয়ে ফেললাম বীজ আর তোমরা গুড়ের সঙ্গে খেলে? ম্যাডাম সেই বিখ্যাত হাসি হেসে বললেন, আমি ঋষির মুখেরটা খেয়েছি। তপশ্রী কারটা কে জানে!

সেলিব্রিটি শেফ সঞ্জীব কাপুরের সঙ্গে

ফুশিয়া পিঙ্কে দারুণ লাগে ম্যাম

শ্যামশ্রী সাহা

গত আগস্ট মাসের প্রথম দিক। রাত আন্দাজ ৮টা। মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠল, ‘মৌ রায়চৌধুরী কলিং...’। ম্যাম ফোন করছেন! এতদিন অফিসে ওঁর কথা শুনেছি। সামনাসামনি কথা হয়নি কখনও। একটু ভয়ে ভয়ে ফোনটা ধরলাম। ওপার থেকে ম্যাম বললেন, ‘শ্যামশ্রী, আমি মৌ রায়চৌধুরী। কাল অফিসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।’ ‘হ্যাঁ’, বলে ফোন রাখতেই বুকের মধ্যে তোলপাড়। কেন ডাকলেন ম্যাম? কোনও ভুল করেছি? কী বলবেন? রাতটা এই ভাবনা নিয়েই কেটে গেল।

অফিসে সেদিন বেশ কয়েকটা মিটিং নিয়ে ব্যস্ত ম্যাম। ঘরের বাইরে অপেক্ষার প্রহর যেন কাটছেই না। সেই সঙ্গে চাপা টেনশনও বাড়ছে। ডাক পড়তেই দরজা খুলে দুরুদুরু বুকে ঢুকলাম। মিষ্টি হেসে বসতে বললেন ম্যাম। ফুশিয়া পিঙ্ক শাড়ি, একই রঙের লিপস্টিকে কী উজ্জ্বল! ম্যামের গভীর, কাজল-কালো চোখ আর হাসিতে সব টেনশনের তখন ‘ওঁ স্বাহা’।

অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল সেদিন। পূজাবার্ষিকীর ফ্যাশন নিয়ে। পুজোর ফ্যাশন পেজ খুব ভাল লেগেছিল ম্যামের। পরে ফোনে সে-কথাও জানালেন। ওঁর প্রশংসায় সেদিন মনে হাজার বাতির আলো। তারপরও কথা হয়েছে। দেখাও হয়েছে অনেকবার। কাজের বিষয়ে দরকার হলে, ‘ম্যাম একটা ফোন করতে পারি?’ মেসেজের কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোন আসত। অল্পদিনেই বুঝে গিয়েছিলাম, ম্যামের মুখটাই তাঁর মনের আয়না। মুখের হাসি বলে দিত, উনি সন্তুষ্ট কি না। ফুশিয়া পিঙ্কে, সাবেকি সাজে আরও কয়েকবার ওঁকে দেখেছি। এটাই কী ম্যামের প্রিয় রং? উত্তর আর জানা হল না।

৪ তারিখ মেসেজের উত্তরে কোনও ফোন এল না। জানতে পারলাম ম্যাম অসুস্থ। ৭ মে দমকা হাওয়া সেই হাজার বাতির আলো নিভিয়ে দিল। বিশ্বাস করি না। করতে চাইও না। ম্যাম, আপনি আমাদের মন জুড়ে আছেন। থাকবেন। চোখ বন্ধ করলেই আপনার হাসিমাখা মুখটাই যে দেখতে পাই। আফসোস, কোনও দিন বলা হল না, ফুশিয়া পিঙ্কে আপনাকে দারুণ লাগে ম্যাম...

যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে

শ্যামলী আচার্য

মরপৃথিবীতে সমস্ত কিছুই নশ্বর। তবুও আকাশের মতো উদার হৃদয় নিয়ে যাঁরা আসেন, তাঁদের ছাপ থেকে যায় চারপাশের সমস্ত মানুষের জীবনচর্যায়, আলাপে, আলোচনায়।

শ্রীমতী মৌ রায়চৌধুরী ছিলেন কোম্পানির কো-চেয়ারপার্সন, আমি সামান্য কর্মী মাত্র। কিন্তু আমাদের ছিল প্রতি মুহূর্তের আদানপ্রদান। ২০২২ সালের মে মাসে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে আজকাল প্রকাশনা বিভাগে চাকরি করতে এসে প্রথম দিন থেকে উপলব্ধি করেছি এই কর্মক্ষেত্রটি তাঁর কাছে নিছক ব্যবসার লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত জগৎ নয়, এটি তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর আইডেন্টিটি। তিনি এই সংস্থাটিকে আগলে রেখেছেন, আঁকড়ে ধরেছেন পরম মমতায়। বই বিভাগ আর আজকাল শারদ সংখ্যার যাবতীয় কাজে, প্রতি মুহূর্তে তিনি ছিলেন সতর্ক, প্রতিটি কাজে নিখুঁত। শারদ সংখ্যার প্রচ্ছদ, আমন্ত্রণপত্রের ডিজাইন, বিজ্ঞাপনের লে-আউট, সমস্ত লেখককে সৌজন্য সংখ্যা পাঠানোর ব্যবস্থাপনা, বইমেলার মঞ্চে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি— প্রতিটি কাজে পরামর্শ দিয়েছেন, ভুল সংশোধন করেছেন, আর আমরা শিখেছি, যেমন-তেমন করে সাজালেই হয় না। আসলে প্রয়োজন হয় ত্রুটিহীন নান্দনিক উপস্থাপনার এবং অপরিসীম যত্নের। যে যত্নে তিনি জড়িয়ে রেখেছিলেন তাঁর সংস্থার প্রতিটি কর্মী।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর আত্মার আত্মীয়, রবীন্দ্র-অনুরাগিণী বলেই বোধহয় শারীরিক যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করার মন্ত্র জানতেন। অফুরন্ত জীবনীশক্তি নিয়ে হাসিমুখে অতিক্রম করে যেতেন অসুস্থতা। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন পরম উদ্যমে।

১১ জুন ২০২২-এ আমার প্রথম বার্তা ছিল তাঁর কাছে, হোয়াটসঅ্যাপে ধরা রয়েছে তারপর থেকে শয়ে শয়ে নির্দেশ, শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল ২০২৪। তারপর আর কথা হয়নি কোনও। অথচ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কত কাজ যে বাকি রয়ে গেল...।

আকাশের মতো মন

অর্য্যাণী ব্যানার্জি

প্রত্যেকটা দুঃখের একটা নিজস্বতা থাকে। যে মানুষটিকে নিয়ে এই লেখা, তিনি নেই, সেটা মেনে নেওয়াটা প্রতি মুহূর্তে অসম্ভব মনে হচ্ছে। মৌ রায়চৌধুরী। এমআরসি ম্যাডাম। আমার মৌ ম্যাম। ওঁকে প্রথম দেখেছিলাম ২০১৪-র কলকাতা বইমেলায়। আমার প্রথম বই প্রকাশের দিন। সেদিনই ওঁর কবিতার বই 'মা' প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ২০১৫ থেকে অনেক অনেক স্মৃতি। আমাকে ভালনামে হয়তো বার কয়েক ডেকেছিলেন প্রথম দিকে, পরে ডাকনাম ধরে, তুই করেই বলতেন। কাজ এবং আইসক্রিম খাওয়া, দুটোই যে সমান মন দিয়ে করতে হয়, ম্যাডাম শিখিয়েছেন। মিটিং হলে, ঘরে যতজন রয়েছে সবার বলা হয়ে গেলে তবে আমায় বলতে দিতেন। কারণ, জানতেন আমি বললেই পরিবেশ লঘু হয়ে যাবে। নিউ ইয়র্কের রাস্তা থেকে শুগার-কোটেড পিনাটস কিনে ব্যাগে জমিয়েছেন। পরের দিন আমাদের খিদে পেলেই বের করে দিচ্ছেন সকালে, দুপুরে, রাতে। শান্তিনিকেতনের বাড়ির বাগানে বসে গান করতে করতে বললেন, 'এখানে এলেই প্রাণটা জুড়িয়ে যায় আমার।' অনেক কথার মধ্যে ওঁর এই কথাটা এখনও কানে বাজে। কখনও অফিস থেকে বেরোনোর সময়, কখনও গাড়িতে ওঠার সময়, কখনও বাইরে গিয়ে, 'বোবো আমার হাতটা একটু ধর তো!'

একমুখ সরল হাসির নীচে বিশাল একটা গোটা আকাশের মতো মন। মানুষ, পশুপাখি, প্রকৃতি, সবটুকুকে এক লহমায় ভালবাসার অটুট বন্ধনে জড়িয়ে ফেলতে পারেন। মাঝরাতে যেমন কাজের কথাও পাঠাতেন, তেমনই, পছন্দের ফাউন্টেন পেন উপহার পেয়েছেন, সেটার ছবিও।

ম্যাম চলে যাওয়ার পর কিছুদিন কেটে গিয়েছে 'মেনে নিতে পারছি না' আর 'মেনে নিতেই হবে'-এর মাঝে একটা অস্বস্তিকর জায়গায় আটকে পড়েছি। একটা সময়ের পর, মনের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মনখারাপেরা একসঙ্গে ভিড় করে আসে, তখন একটা দমচাপা কষ্ট ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে চায়। তবে ঠিক করেছি, মৌ ম্যামকে উদ্‌যাপন করব আমার বাকিটা জীবন। তাই শুধু খুশির মুহূর্তগুলো মনে রেখে এগোব এখন থেকে। উনি তো কবিতা লিখতেন, ভালবাসতেন। কবিতার দুটো লাইন পড়ার মাঝে শ্বাস নেওয়ার জন্য এক মুহূর্ত থামি, ওই অমর জায়গাটায় ওঁকে রেখে দিলাম, চিরতরে...।

Words fall short when I remember You

Minal Pareek

Words fall short when I remember our MRC ma'am. The night she struggled for life was 6th May,2024.The deadly night when we could see her gasping for breath, gasping for life. A woman who was full of life and always had some new plans to implement. The bright sarees with matching jewellery and shining bright amongst all. She was the one stop solution to many like me. I am close knitted with the aajkaal. in family, she was the apex of this team. Whether it was day or night she was always closely monitoring the platform and guiding us throughout. Whenever there was any issue, trouble, confusion, she was there listening and solving them. We all know her as a great motherly woman, but she was also a great boss. She was open to new ideas, methods and understood the changing scenario nicely. Everyone knows how culturally rich her engagement was, in every programme, MRC ma'am had her own menu of culture and tradition. Her stage programmes were larger than life with all the stalwarts of cultural world on stage and she being their lovable Boudi.

Ma'am, we miss that space where we could open our hearts. Where we used decide how our Annual Fest would be. How you always helped us to organise everything so seamlessly.

A person who was so full of life and beauty. The arddhangini of our beloved SRC sir. The void that you have created is forever. The real mother of Techno India Group. The entrepreneur. The boss. The anchor. Miss you ma'am.

সব যাওয়া, যাওয়া নয়...

তমাল গুহ

'কষ্ট যদি দাও হে প্রভু, শক্তি দিও সহিবারে'। অকালপ্রয়াণের বিয়োগ-যন্ত্রণায় টেকনো ইন্ডিয়া পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মতোই আমিও হতবাক। শ্রদ্ধেয় মৌ ম্যাডাম আর নেই! ২৫ বছরের সম্পর্ক, স্মৃতি এক লহমায় সব শেষ! কত কিছুই না শিখেছি তাঁর কাছে। সমৃদ্ধ হয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে। মৃদু বকুনি— না, তাতে কোনও ভয় কিংবা অসম্মানের কিছু ছিল না কখনওই, ছিল বাড়ির মায়ের কিংবা অভিভাবিকার ভুল শোধরানোর শিক্ষা। পেয়েছিলাম আন্তরিকতার পরশ, গ্রুপের কোনও কর্মী হিসেবে নয়, পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে।

এক বাঙালি যুবকের স্বপ্ন-প্রত্যয়, শিক্ষার প্রসার ও উদ্যোগে এবং তার বাস্তবায়নে প্রাণিত করেছেন প্রায় চার দশক জুড়ে। না, নিজেকে জাহির করে নয়, অন্তরালে থেকে, পরম মমতায়, নিজেকে উজাড় করে, বিলিয়ে দিয়ে। শুধুমাত্র শিক্ষা উদ্যোগের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে, সংস্কৃতির সব ধারাতেই তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। নির্দিষ্ট করে বললে, বাংলার ও বাঙালির কৃষ্টিতে।

রবি ঠাকুরের আরাধনায়, বিশেষত গানে তিনি প্রাণ খুঁজে পেতেন। তিনি নিজেকে যতটা প্রকাশ করতে চাইতেন, তার থেকেও বেশি খুঁজে বেড়াতেন অজানা প্রতিভার অন্বেষণ ঘটাতে। অজানা প্রতিভাগুলিকে প্রকাশ্যে এনে বিকশিত করতে। প্রকৃতির মধ্যে তিনি খুঁজে পেতেন নানা সুর ও সৃষ্টি। তাঁর মননে ছিল শিক্ষার প্রসার। আজকের টেকনো ইন্ডিয়ার এই শাখাপ্রশাখার ব্যাপ্তির মধ্যে আছে মৌ ম্যাডামের সেই মননশীল চিন্তার নির্যাস। স্বভাবতই লেখক, নাট্যকার, গায়ক, চিত্রশিল্পী— এক কথায় সৃষ্টিশীল সকল গুণিজনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্য ছিল। ভাল যোগাযোগ ছিল খেলার জগতের সঙ্গেও। পুনরায় চালু করেছিলেন 'খেলা' পত্রিকা। আমরা যারা মধ্য-পঞ্চাশ, মফস্‌সলের ছেলে, ফুটবল কিংবা ক্রিকেটের মাঠে স্কুল-কলেজে দিন কেটেছে, তাদের কাছে 'খেলা' পত্রিকা যে কত বড় আবেগ, তা বলে বোঝানো কঠিন।

সুস্থ, সফর এবং শারদীয়া আজকালের রচনাসম্ভার নতুন করে আজকের প্রজন্মের কাছে গ্রহণীয় করার মূলেও সেই আমাদের মৌ ম্যাডাম। উত্তরবঙ্গে এলে আমরা খানিক তটস্থ থাকতাম ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি উন্মুখ হতাম, খুশি হতাম। প্রাপ্তির ভাঁড়ার পূর্তির আনন্দে। আমার এবং আমাদের, যাদের এসআইটিতে পথচলা শুরু সেই এসআইটি— যার সঙ্গে আমাদের ঋষির জীবনের বেড়ে ওঠার সহযাত্রা, তারা জানি, চা-বাগান, অভয়ারণ্য, নদনদী এবং সর্বোপরি হিমালয়ের সান্নিধ্যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও জনজাতি-অধ্যুষিত সামাজিক বৈচিত্রের মেলবন্ধনে যে অপার উত্তরবঙ্গ, যেখানে প্রতিটি জেলায় আজ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ তথা শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী স্যর-এর উদ্যোগের সফল রূপায়ণ, সেই সকল ইউনিটের উঠোন জুড়ে মৌ ম্যাডামের উজ্জ্বল উপস্থিতি স্মৃতির ক্যানভাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। কোনও মৃত্যু আমাদের থেকে ম্যাডামের হাসিমুখের স্নেহচ্ছায়া ছিনিয়ে নিতে পারবে না কোনও দিনই। স্বজন হারানোর কান্না আর আফসোসের দীর্ঘশ্বাস নিয়েই আমাদের প্রতিটি আগামিকাল আসবে, কি পেশাগত, কি পারিবারিক দিনযাপনে।

বছরের পর বছর কেটে যাবে, সারা ভারত জুড়েই টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের মুকুটে যোগ হতে থাকবে আরও অনেক বহুমাত্রিক উদ্যোগের বিস্তার। বহুল সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হবে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কিংবা সম্মিলনী আয়োজন। নতুন থেকে নতুনতর প্রজন্মকে আলোর পথযাত্রী করার ব্রতে ম্যাডামের জীবনবোধের সার্থক উত্তরাধিকার হওয়ার চেষ্টা করব। আর এসবের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হোক আমদের যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

অনেক অনুপ্রেরণা পেয়েছি

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

শ্রদ্ধেয়া মৌ রায়চৌধুরী। বয়সে ছোট হলেও, কর্মক্ষেত্রে আমার কাছে ম্যাম হলেও অন্তরের ভালবাসায় আমার বন্ধুত্বের এক চরম ভাললাগার জায়গা। কীভাবে কাছে টেনে আগলে রাখতে হয়, তা জেনেছি তোমার কাছে। যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়, অজান্তে আমরা একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছি। তোমার সদাহাস্যময় মুখ এবং মিষ্টি ব্যবহার যারা তোমার সংস্পর্শে এসেছে আমার মতো সকলেই তা অনুভব করে। তুমি বা তোমরা যেহেতু হুগলির বাসিন্দা, আমি হুগলি টেকনো স্কুলের অধ্যক্ষা হয়ে আসায় তোমাদের কাছাকাছি আসতে পারাটাকে আমার বাড়তি পাওনা হিসেবে মনে করি। তাই আমি অনেক সময় তোমাদের একজনকে বলি 'Son of the soil' এবং অন্যজনকে 'Daughter of the soil'। হয়তো এমনও হয়েছে, আমাদের দু'জনের সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়নি, ফোনের মাধ্যমে অনেক মনের কথার আদানপ্রদান হয়েছে; যা আমাদের একান্ত নিজের। অনেক সময় সেখান থেকে আমি অনেক অনুপ্রেরণাও পেয়েছি। যা আমি চিরকাল বয়ে বেড়াব।

আমার কাজের জায়গায় বসার ঘরে, তোমাদের পরিবারের একটা ছবি আছে। চেয়ারে বসলে তা সামনাসামনি রোজই চোখে পড়ে। আজ সেই টেবিলে বসে তোমারই ছবির সামনে তোমাকে নিয়ে লিখছি। এটা আমার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য এবং বেদনাময়।

বোলপুরে এ বছর দোল উৎসবে আমিও তোমাদের সঙ্গে সেখানে সামিল হয়েছিলাম। কী ভালই না অনুষ্ঠান হয়েছিল! আমি সমস্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করেছিলাম। ভাবতে পারিনি, সেই অনুষ্ঠানেই তোমার কণ্ঠের শেষ আবৃত্তি ও গান শুনব। মনোমুগ্ধ হয়ে সেদিন তোমার সমস্ত গল্পপাঠও শুনেছি। আজ ভাবতে বসে দেখছি, সব স্মৃতি হয়ে গেল!

তুমি যে কর্মযজ্ঞ রচনা করে গেছ, সেখানে আজ সবাই তোমার বিদায়বেলায় ব্যথিত, মর্মাহত। তাদের একটাই প্রশ্ন— তোমার মতো করে কে আজ তাদের অভাব-অভিযোগ, ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা শুনবে এবং তোমার মতো করে খুব সহজেই ঠান্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান করবে? তোমার ছবির সামনে বসে আজ বেদনা-বিধুর হৃদয় নিয়ে বলছি— জানি না, তুমি কোথায় কীভাবে আছ। তুমি যেখানে গেছ, সেখানেও তুমি একইভাবে তোমার আনন্দ-উচ্ছলতা এবং ভালবাসার বন্ধনে সবাইকে বেঁধে রেখো। তোমার সেই নতুন আলোকোজ্জ্বল জগতে সবাইকে আলোকিত কোরো এবং নিজেও ভাল থেকো।

ঢাকায় বসে চপ-পেঁয়াজি চাইলেন

অরিন্দম মুখার্জি

‘ম্যাডাম’ আমাদের জগৎমাতা। তাঁকে নিয়ে কত কথা যে বলার আছে। কত সুন্দর সব আনন্দের কথা, সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা। আমাদের ভালবেসেছেন অন্তর দিয়ে। মানুষকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন চিরকাল। কয়েকটা কথা শেয়ার করি, যখন কারেকশনাল হোমে কাজ করতাম, ম্যাডাম সবসময় উৎসাহ দিতেন। বলতেন, ‘এরকম কাজ আরও কর।’ তিনি নিজেও এমন কিছু কাজ করে গিয়েছেন, অনেকেই তা জানেন না। তিনি বিভিন্ন আশ্রম থেকে শুরু করে দরিদ্র মানুষদের মাসের পর মাস সহায়তা করেছেন, কিন্তু কখনও আলোয় আসেননি। আড়াল থেকে কাজ করে গিয়েছেন। পথ কুকুরদের জন্য বিপুল পরিমাণ চাল পাঠাতেন।

একটা মজার কথা বলি। আমার বাড়ি গঙ্গার ধারে। একদিন বললেন, ‘ইলিশ মাছ পাওয়া যায়? নিয়ে আসবে তো।’ আমি জানালাম, ‘হ্যাঁ ম্যাডাম। ভাল ইলিশ পাওয়া যায়।’ আবার ফোন। জানালেন, ‘জেলে ভাইদের বল, মাছটা বড় হবে, কিন্তু যেন ডিম না থাকে।’ নিজে খেতে ভালবাসতেন, অন্যকে খাওয়াতেও। একবার বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলাম। একদিন বললেন, ‘দেখো তো, একটু চপ-পেঁয়াজি কোথায় পাওয়া যায়। খেতে খুব ইচ্ছে করছে।’ সকলে মিলে হইচই করে খাওয়া হল। এমন কত কথা আছে, বলতে গেলে দিন-রাত ফুরিয়ে যাবে।

জানি, ম্যাডাম আমাদের সঙ্গেই আছেন। ভাল আছেন।

কলকাতা বইমেলার মঞ্চে। রয়েছেন প্রচেত গুপ্ত ও রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২৪

স্মৃতি থাক অমলিন

শিবাজী পণ্ডিত

আজকাল বই বিভাগের একজন সুচারু পরিচালক ছিলেন ম্যাডাম। কয়েক বছর ধরে আজকাল প্রকাশনকে সজাগ দৃষ্টিতে যেভাবে আগলে রেখেছেন, সেটা সত্যিই অনস্বীকার্য। তিনি আমাদের কর্মী বলে মনে করতেন না। বলতেন ‘সহকর্মী’। বইমেলায় আজকাল বই প্রকাশের মঞ্চে আমরা যারা বই দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত, সকলকে ডেকে নিতেন। উদাত্ত কণ্ঠে বলতেন— ‘প্রতিটি বইয়ে আছে আমার সহকর্মীদের আন্তরিকতার ছাপ।’ এটাই আমাদের কাছে মহাপ্রাপ্তি।

২৮ মার্চ বই প্রকাশনের মিটিং। মিটিংয়ে আজকাল পুজোসংখ্যা এবং বইমেলায় আমরা কোন্ বই প্রকাশ করব, তা নিয়ে আলোচনা হল। মিটিং শেষে ম্যাডাম হাসিমুখে বললেন, খুব তাড়াতাড়ি আসব। পুজোসংখ্যা নিয়ে একটা ফাইনাল মিটিং করব।

জানি আপনি অনন্তলোকে যাত্রা করেছেন, আর কোনও দিনও আসবেন না। তবু আমরা অপেক্ষা করছি ম্যাডাম। আপনাকে ছাড়া আজকাল বই বিভাগ যে মাতৃহারা।

ভালবাসা আর শাসনের বাঁধনটা হারিয়ে গেল

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো-চেয়ারপার্সন, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডি সদস্য, আজকাল দৈনিকের ডিরেক্টর। মৌ রায়চৌধুরী। নিপুণতার সঙ্গে সামলেছেন সর্বক্ষেত্র। সামলেছেন রায়চৌধুরী বাড়ি, আগলে রেখেছেন কর্মক্ষেত্র। তবে, 'কর্মক্ষেত্র'কে আদতে তিনি 'কাজের জায়গা' তকমা দিয়ে রাখেননি। হাসিমুখে ঢুকেছেন অফিসে, সকলের খোঁজ নিয়েছেন। ডিমের চপ, মুড়ি-মাখা আনিয়েছেন উৎসাহিত হয়ে। নিজে খাওয়ার আগে অন্যদের বলেছেন, 'খেয়ে নাও।' গত কয়েকদিন ধরে টেকনো ইন্ডিয়ার ছ'তলায় অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। যে ঘরে আলো হয়ে বসতেন 'ম্যাডাম', সেখানে টেবিলের ওপর তাঁরই ছবি সাজানো। পঁচিশে বৈশাখে তাঁর প্রিয় রবি ঠাকুরের ছবিতে মালা দেওয়ার সঙ্গেই তাঁর ছবিতেও মালা দিতে হয়েছে। 'এই দিন কেন এল?' বিড়বিড় করছেন তিয়াসা, বিষ্ণুরা।

বহু বছর ধরে 'ম্যাডাম'-এর সঙ্গে কাজ করছেন গৌতম কুণ্ডু। বলছেন, 'ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন যেমন কাজের, তেমনই আগলে রেখেছিলেন তিনি। কাজ ভাল লাগলে প্রশংসা করতেন মন খুলে। ম্যাডাম মাথার ওপর একটা গাছ ছিলেন। সেই গাছটাই আচমকা সরে গেল। ওঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কাজ করছি। আর কিছু কি বলার থাকতে পারে! পারে না...'

রণধীর শর্মা, এক দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন 'ম্যাডাম'-এর সঙ্গে। 'পাপান স্যর'-এর বিয়ের কার্ড তৈরি থেকে এখনও পর্যন্ত, মনে পড়ছে বহু কথা। ম্যাডামকে নিয়ে কিছু বলবেন কী! গলা বুজে আসছে। তবুও বললেন, 'কোনও কোম্পানির মালিক ভেন্ডারের সঙ্গে কথা বলেন না। ম্যাডাম তা-ও করেছেন। ওঁর কাছে কাজ করেছি এতদিন, ম্যাডাম সব

নিজেই সামলে নিতেন। মনে হত ম্যাডাম একজন আর্ট ডিরেক্টর। কাউকে কর্মী নয়, নিজের বাড়ির লোকের মতোই ভাবতেন। মাথার ওপর বটগাছ ছিলেন ম্যাডাম।'

উজ্জ্বল রায়ের বারবার মনে পড়ছে শুরুর দিনের কথা। টেকনোয় কাজে যোগ দেওয়ার দিন, কীভাবে 'ম্যাডাম' তাঁকে ঠিকানা বুঝিয়ে উল্টোডাঙা থেকে এনেছিলেন টেকনোয়। মনে পড়ছে পা ভেঙে গিয়েছিল যেবার, সেবার বিদেশে যাওয়ার আগে 'মায়ের' মতো সব ব্যবস্থা করে, খোঁজখবর নিয়েছিলেন 'ম্যাডাম'। পুরনো কথা মনে করে বলছিলেন, 'ম্যাডাম আমাদের অভিভাবক ছিলেন, তিনি নেই, এটা মেনে নিতেই কষ্ট হচ্ছে। শেষ কথা হল ৩০ তারিখ। সেদিনও জিজ্ঞেস করলেন শরীর ভাল আছে কি না। নতুন বই-সহ নানা বিষয়ে কথা হল। বারবার বলেছেন সৎ থাকতে। বুঝিয়েছেন, কাজে সৎ থাকলে কাউকে ভয় করার দরকার নেই। আমরা মাতৃহারা হলাম।'

'ম্যাডাম' বকুনি দিয়েছেন বহুবার। কিন্তু পরমুহূর্তেই পরিস্থিতি হালকা করে নিতেন। বুঝিয়ে দিতেন বকুনির কারণ, পরে যেন আর এই ভুল না হয়। এসব কথাই এখন টেকনোর ছ'তলায় বসে ভাবছেন জয়দীপ রায়। বলছেন, 'যে কোনও মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত। সবসময়, সব কাজের আপডেট নজরে ছিল তাঁর। ছ'তলায় 'ম্যাডাম' এলেই মনে হত, অভিভাবক রয়েছেন সঙ্গে। বইমেলায় শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। এত বড় ইউনিটের সকলকে চিনতেন, সকলের নাম পর্যন্ত মনে ছিল।' সেকথাই মনে পড়ছে বিষ্ণু দেব মণ্ডলেরও। বললেন, 'এত বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। হাউসকিপিং স্টাফ থেকে, পিওন থেকে ড্রাইভার, সকলের নাম জানতেন। সকলের নম্বর জানতেন। সকলের সঙ্গে কথা বলতেন। আমাকে টেকনোয় ম্যাডামই নিয়ে এসেছিলেন। সেই ২০০৭ থেকে দেখছি। খুব স্বাভাবিক জীবনযাপন ছিল। স্ট্রিট ফুড খেতে ভালবাসতেন। চপ-মুড়ি, ডিমের ডেভিল খেতে বড় ভালবাসতেন, আর সঙ্গে কফি। লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। সকলের সঙ্গে এত মিশে ছিলেন।'

'ম্যাডাম নেই' এই খবরটা অফিসে আসার পথে পেয়েছিলেন তিয়াসা বিদ। এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না, কী ঘটে গিয়েছে। গত কয়েক বছর তিনি ম্যাডামের সঙ্গে কাজ করছেন। ফোনে কোনও শব্দ হলেই দেখতেন ম্যাডাম কিছু বলছেন কি না! এখন গোটা অফিস 'ফাঁকা' লাগছে। প্রতিদিন সকালে মালা দিতে হচ্ছে ম্যাডামের ছবিতে। বলছেন, 'এই কাজ করতে হবে, কখনও ভাবিনি।'

মিতা সেন, টেকনোর সঙ্গে যুক্ত সেই ২০০৩ থেকে। বলছেন, 'টেকনোর মা-কে হারালাম।' সুজেতা নাথ বারবার ম্যাডামকে দেখে অবাক হয়েছেন। ভেবেছেন, 'একজন ঘোর সংসারী মানুষ কী অনায়াসে এই প্রতিষ্ঠানকে জীবনের ভ্যালুজ, নিয়ম আর নান্দনিকতা দিয়ে বেঁধে রাখেন!' বলছেন, 'ম্যাডামের এক হাতে ছিল ভালবাসার বাঁধন, অন্য হাতে শাসনের ছড়ি।' শেখ নজরুল ইসলাম, সৌরেন ব্যানার্জি, ভক্তরাম সাফুই, দুধকুমার নস্কর, সমীর রানা, প্রসেনজিৎ রায়চৌধুরি— কেউই ভাবেননি, একদিন তাঁদের প্রিয় 'ম্যাডাম'কে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে হবে। সিনেমা থেকে সংস্কৃতি, সমাজের মানুষের কথা ভাবা 'ম্যাডাম'কে তাঁরা দেখেছেন। যে কোনও প্রয়োজনে নিশ্চুপে পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

এখন ছ'তলায় 'ম্যাডাম'-এর হাসি খুঁজছেন তাঁরা, গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন ওই ঘরের সামনে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ম্যাডামের বকুনিরও...।

ইচ্ছে করে, ইচ্ছেগুলো
উড়ুক ডানা মেলে,
ইচ্ছে করে মনের কথা
বেড়াক মাঠে খেলে।

—মৌ রায়চৌধুরী